লাস্ট থ্রি মিনিটস

অষ্টম অধ্যায়: ধীর গতির জীবন

১৯৭২ সালে *ক্লাব অব রোম* নামে একটি সংগঠন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে *দ্য লিমিটস টু গ্রোথ* একটি নেতিবাচক পূর্বাভাস প্রকাশ করে। তারা আসন্ন বিভিন্ন দূর্যোগ বিষয়ক অনেকগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করে এতে। এর মধ্য অন্যতম ছিল জীবাশ্ম জ্বালানি বিষয়ক। তাদের মতে, অল্প কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর সব জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে। মানুষ ভয় পেল। তেলের দাম গেল বেড়ে। বিকল্প জ্বালানি নিয়ে গবেষণা গতি পেল। এখন আমরা ১৯৯০ এর দশকে আছি।১ কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার লক্ষ্মণ এখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ফলে ভয়ের বদলে এখন সবার মনে রয়েছে পরিতৃপ্তি। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সরল গাণিতিক হিসাব বলছে, সম্পদের সসীম পরিমাণ চিরকাল যাবত নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, জ্বালানি ঘাটতির মুখোমুখি আমাদেরকে হতেই হবে। পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্পর্কেও একই কথা খাটে। অনির্দিষ্ট সময় ধরে এটা অব্যাহত থাকতে পারে না।

জেরেমিয়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর কিছু কিছু মানুষ মনে করে,ও আসন্ন জ্বালানি সঙ্কট ও অতিজনসংখ্যার ফলে মানুষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গেলেই মানুষেরও অবসান ঘটে যাবে বলা যাচ্ছে না। আমাদের চারপাশে জ্বালানির বিপুল উৎস রয়েছে। অবশ্য সেটা কাজে লাগানোর মতো বুদ্ধিমত্তা থাকা চাই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আমাদের যতটুকু শক্তি দরকার সূর্যের আলোতে তার চেয়ে বেশি শক্তি রয়েছে। আরেকটি বড় সমস্যা আছে। হয়ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি আমরা কমানোর আগেই খাদ্যাভাবে সেটা এমনিতেই কমে যাবে। এর জন্যে বৈজ্ঞানিক কৌশলের চেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল বেশি প্রয়োজন। তবে আমার বিশ্বাস, জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে শক্তির যে ঘাটতি তৈরি হবে সেটার সমাধান করা গেলে এবং আমাদের গ্রহের বাস্তুগুত ও গ্রহাণুর আঘাতজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনা গেলে মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মানবজাতির ভবিষ্যতকে সীমিত করার মতো স্পষ্ট কোনো নিয়ম প্রকৃতিতে চোখে পড়ছে না।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমি বলেছি কীভাবে অসম্ভব দীর্ঘ সময় পরে মহাবিশ্বের কাঠামো বদলে যাবে। সাধারণত এর মাধ্যমে ধীরগতির ভৌত প্রক্রিয়ার প্রভাবে মহাবিশ্ব নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো হারাবে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব আছে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর হলো (এটা নির্ভর করে মানুষের সংজ্ঞার ওপর)। আর সভ্যতার সূচনা কয়েক হাজার বছর আগে। এখন থেকে আরও দুই বা তিন শ কোটি বছর পৃথিবী বাসযোগ্য থাকবে। তবে জনসংখ্যা অবশ্যই কমে যাবে। সময়টা এত দীর্ঘ যে সেটা কল্পনা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একে এতই বড় মনে হয় যে সেটাকে বাস্তবে অসীম সময় বলে মনে হয়। তবুও আমরা দেখেছি, মহাবিশ্বের বিবর্তনের জন্যে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় সে তুলনায় এক শ কোটি বছরও খুব নস্যি। আরও বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পরেও আমাদের ছায়াপথের অন্য কোথাও পৃথিবীর মতো আবাস থাকতেই পারে।

আমরা কল্পনা করতেই পারি আমাদের বংশধররা এত সময় হাতে পেয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াবে। বানাবে সব ধরনের বিস্ময়কর যন্ত্রপাতি। সূর্য পৃথিবীকে পুড়িয়ে ফেলার আগে আগে পালানোর যথেষ্ট সময় তারা পাবে। খুঁজে নিতে আপ্রবে অন্য এক গ্রহ। তারপর আরেকটি। তারপর আরেকটি। মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়লে জনসংখ্যাও বাড়বে। এটা জেনে কি আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে বিংশ শতকে আমাদের টিকে থাকার লড়াই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ নাও হতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বলেছি, বার্ট্রান্ড রাসেল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের ফলাফল নিয়ে হতাশাচ্ছান্ন ছিলেন। যন্ত্রণা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, যেহেতু সৌরগজগৎ এক সময় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাই মানুষের অস্তিত্বও একসময় নিষ্ফল হবে। রাসেল স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, আমাদের বাসস্থানের স্পষ্ট অনিবার্য মৃত্যু কোনোভাবে মানবজীবনকে অর্থহীন কিংবা প্রহসনে পরিণত করেছে। এটা নিশ্চিত এই বিশ্বাস তাকে নাস্তিক বানানোর পথে অবদান রেখেছে। ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় শক্তি সূর্যের বহুগুণ বেশি এবং সৌরজগৎ তছনছ হয়ে যাওয়ারও লক্ষ লক্ষ কোটি বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে জানলে কি তিনি আরেকটু ভাল অনুভব করতেন? আসলে সময়টা কত দীর্ঘ সেটা মূখ্য নয়। মূল বিষয় হলো, আজ হোক, কাল হোক, মহাবিশ্ব এক সময় বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। এ কারণে কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের অস্তিত্ব অর্থহীন।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। হয়ত আমরা ধরে নিতে পারি, আরও কম পরিবর্তনযোগ্য ও বেশি বৈরি পরিবেশ তৈরি হবে না বললেই চলে। তবে আমাদের ভাবনাই যে সঠিক সেটা ধরে নেওয়া যাবে না। আবার হতাশও হওয়া যাবে না। ইলেকট্রন ও পজিট্রন দিয়ে গড়া এক পাতলা স্যুপের মতো মহাবিশ্বে বাস করা মানুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে কঠিন হবে। তবে আমাদের কথা সেখানে নয়। অবশ্যই মানব প্রজাতি অমর কি না আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছি না। আমাদের বংশধররা টিকে থাকতে পারবে কি না সেটা বলছি। আর আমাদের বংশধররা যে মানুষই হবে তার সম্ভবনাও কম।

জীবের বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়া খবু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমরা হস্তক্ষেপ করে ফেলেছি। মিউটেশন বা পরিব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করা দিন দিন সহজ হয়ে যাচ্ছে। জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যেম খুব দ্রুতই হয়ত আমরা ইচ্ছেমতো গুণ ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যেসম্পন্ন মানুষ বানাতে পারব। জৈবপ্রযুক্তির এই সম্ভাবনাগুলো মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে তৈরি হয়েছে। একবার ভাবুন, হাজার হাজার বা লক্ষ বছরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার মাধ্যমে কী সম্ভব হতে পারে।

মাত্র কয়েক দশকেই মানুষ গ্রহ থেকে বের হয়ে নিকট মহাকাশে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌরজগতের আরও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর যাবে ছায়াপথের অন্য নক্ষত্রে। অনেক সময় মানুষ ভুল করে মনে করে, এ কাজ করতে অসীম সময় লাগবে। আসলে তা নয়। বসতি গড়ার প্রক্রিয়াটি হয়ত হবে বারবার গ্রহান্তরের মাধ্যমে। বসতিস্থাপনকারীরা পৃথিবী ছেড়ে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের অন্য কোনো উপযুক্ত গ্রহে ঠাঁই নেবে। আলোর কাছাকাছি বেগে চলতে পারলে তাতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক বছর। আমাদের বংশধররা আলোর এক ভাগের মতো যথেষ্ট গতি অর্জন করতে না পারলেও ভ্রমণে সময় লাগবে মাত্র কয়েক শ বছর। নতুন একটি বসতি পুরোপুরি গড়ে তুলতে হয়ত আরও কয়েক শ বছর লাগবে। ততক্ষণে নতুন কোনো গ্রহের সন্ধানে এক দল অভিযাত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়ার চিন্তা করা যাবে। আরও কয়েক শ বছর পরে সেই গ্রহেও বসটি গড়ে ওঠবে। এভাবেই চলতে থাকবে। পলিনেশীয়রা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলোতে এভাবেই বসতি নির্মাণ করেছিল।

ছায়াপথকে অতিক্রম করতে আলোর এক লক্ষ বছর সময় লাগে। আলোর বেগের এক ভাগ বেগে চললে তাতে সময় লাগবে এক কোটি বছর। এই যাত্রাপথে এক লক্ষ গ্রহে বসতিস্থাপন করা গেলে এবং প্রতিটির জন্যে দুই শ বছর লাগলে পুরো ছায়াপথে বসতি গাঁড়তে ছায়াপথ পার হবার সময়ের তিনগুণের বেশি সময় লাগবে না। তবে মহাকাশ বা ভূতাত্ত্বিক মাপকাঠির তুলনায় এক কোটি বছর খুব অল্প সময়। সূর্য পুরো ছায়াপথকে একবার ঘুরে আসতে প্রায় ২০ কোটি বছর সময় নেয়। এর অন্তত ১৭ গুণ সময় ধরে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। সূর্যের বার্ধ্যকের কারণে পৃথিবী বিপদে পড়তে মাত্র দুই না দিন শ কোটি বছর লাগবে। ফলে আরও তিন কোটি বছরে খুব অল্প পরিবর্তনই ঘটবে। তার মানে বলতে চাচ্ছি, পৃথিবীর বুকে প্রযুক্তিগত সভ্যতা গড়ে উঠতে যতটুকু সময় লেগেছে, পুরো ছায়াপথে বসতি গড়তে তার খুব সামান্য ভগ্নাংশের সমান সময় লাগবে।

বসতি গড়ে তোলা আমাদের এই বংশধররা কেমন হবে? কল্পনার ঘোড়াকে ইচ্ছেমতো ছুটতে দিলে আমরা ধারণা করতে পারি, জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা কাঙ্ক্ষিত গ্রহের পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে। একটি সরল উদাহরণ চিন্তা করি। ধরা যাক, এপসাইলন এরিডানি নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ পাওয়া গেল। দেখা গেল, এর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে মাত্র ১০%। তাহলে অধিবাসীদের দেহকে পরিবর্তন করে লোহিত রক্তকণিকা বাড়াতে হবে। গ্রহটির পৃষ্ঠের মহাকর্ষ বেশি হলে অধিবাসীদের দেহকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। হাড়কেও শক্ত করতে হবে। এভাবেই সবকিছু বদলে নিতে হবে।

এই ভ্রমণের জন্যে যা যা লাগবে তাতে সমস্যাও হওয়ার কথা নয়। যদি তাতে কয়েক শ বছর লাগে তবুও নয়। মহাকাশযানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে বানানো যেতে পারে। যা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অভিযাত্রীদেরকে কয়েক প্রজন্ম ধরে আবাসন দিতে সক্ষম হবে। আবার অভিযাত্রীদেরকে ভ্রমণের সময় তীব্র ঠাণ্ডা পরিবেশে জমিয়ে রাখা যেতে পারে।২ সত্যি বলতে, ছোট একটি যানে অল্প কিছুসংখ্যক কর্মীসহ লক্ষ হিমায়িত নিষিক্ত কোষ পাঠানোই বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর সেগুলো থেকে জন্ম নেবে মানুষ। এতে করে নতুন গ্রহে তাৎক্ষণিকভাবে এক দল অধিবাসী পাওয়া যাবে। বিপুল পরিমাণ বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবহনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে না।

আরেকটি বিষয়: আমাদেরকে ধরে নিতে হচ্ছে, এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু হওয়া সম্ভব। ফলে ভবিষ্যতে বসতি গাঁড়া মানুষগুলো যে চেহারা-সুরত বা মানসিকতায় যে মানুষের মতোই হবে সেটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। যদি মানুষকে প্রয়োজন অনুসারে বদলে নেওয়া নেওয়া যায়, তাহলে প্রতিটি অভিযানেই প্রস্তাবিত নকশা অনুসারে প্রাণী বানিয়ে নেওয়া যায়। যাতে থাকে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শরীর ও মনের সমন্বয়।

বসতিস্থাপনকারীদেরকে সাধারণ সংজ্ঞার জীবিত প্রাণীও হতে হবে না। এখনই মানুষের মধ্যে সিলিকন-চিপের মাইক্রোপ্রসেসর স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হলে জৈব ও কৃত্রিম বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের মিশ্রণহতেই পারে। যাতে করে শারীরবৃত্তিক কাজের পাশপাশি মস্তিষ্কও ঠিকভাবে কাজ করবে। যেমন ধরুন, মানুষের মস্তিষ্কের জন্যে বোল্ট-অন স্মৃতি তৈরি করা যেতে পারে। অনেকটা কম্পিউটারের যেভাবে অতিরিক্ত মেমোরি লাগানো হয়। উল্টোভাবে আবার এমনও হতে পারে যে জৈব পদার্থর জন্যে যন্ত্রাংশ তৈরির চেয়ে হিসাব-নিকাশ করার প্রতি অভ্যস্ত হওয়া বেশি কার্যকরী হবে। তার মানে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলোকে জৈব উপায়ে বিকশিত করা যাবে। ডিজিটাল কম্পিউটারের বদলে নিউরাল নেট চলে আসার সম্ভাবনা আরও বেশি। এমনকি এখনই ডিজিটাল কম্পিউটারের নিউরাল নেট ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপিত করা হচ্ছে। পূর্বানুমান করা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আচরণ। মস্তিষ্কের টিস্যুর একটি অংশ নিয়ে তা দিয়ে শুরু থেকেই জৈব নিউরাল নেট বানানোটাই হয়ত আরও বেশি অর্থপূর্ণ হবে। জৈব ও কৃত্রিম নেতওয়ার্কের একটি বন্ধন তৈরি হবে খুবই যুক্তিসঙ্গত। ন্যানোপ্রযুক্তির আবির্ভাবের সাথে সাথে জীবিত ও মৃত, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের পার্থক্য ক্রমেই ছোট হয়ে আসবে।

বর্তমানে এসব অনুমান বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতেই শুধু পাওয়া যায়। এগুলোকে বৈজ্ঞানিক বাস্তবে পরিণত হতে পারে?আর যাই হোক, আমরা কোনো কিছু অনুমান করতে পারি বলেই যে সেটা সত্যি হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। তবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেমন নীতি প্রয়োগ করেছি সেটা করতে পারি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও।যথেষ্ট বেশি সময় পাওয়া গেলে যা যা ঘটতে পারে তার সবই ঘটবে। যদি মানুষ বা তাদের বংশধররা যথেষ্ট উৎসাহী থাকে (এটা হয়ত অনেক যদি-কিন্তুর ব্যাপার), তাহলে পদার্থবিদ্যার সূত্র ছাড়া আর কিছুই প্রযুক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এক প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের জন্য মানব জিনোম প্রকল্প কষ্টসাধ্য এক কাজ। কিন্তু শত শত, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ প্রজন্ম এই কাজ করতে থাকলে কাজটি হয়ে যাবে অনায়াসেই।

আশাবাদীই হওয়া যাক। ধরুন আমরা বেঁচে যাব। আর আমাদের প্রযুক্তির উন্নয়ন সর্বোচ্চ শিখরে যেতে থাকবে। মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কী হবে? ধরুন, উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বুদ্ধিমান জীব বানানো সম্ভব হলো। এর ফলে এখন যেসব বৈরি জায়গায় প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না সেখানেও সেটা করা যাবে। এই প্রাণীগুলো মনুষ্য-নির্মিত প্রযুক্তিরই ফসল হলেও এরা নিজেরা কিন্তু মানুষ হবে না।

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কি চিন্তিত হওয়া উচিত? মানুষের বদলে এ ধরনের দানব চলে আসতে পারে ভাবলেই অনেকের মধ্যে বিরক্তি কাজ করে। টিকে থাকার জন্য জিনপ্রকৌশলের মাধ্যমে নির্মিত জৈব রোবটের কাছে জায়গা ছেড়ে দিতে হলে হয়ত দেওয়াই উচিত। তবুও মানুষের অবসান যদি আমাদেরকে হতাশ করে, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত আমরা মানুষের ঠিক কোন জিনিসটি সংরক্ষণ করতে চাই। অবশ্যই আমাদের শারীরিক আকৃতি নয়। আজ থেকে ১০ লক্ষ বছর পরে আমাদের বংশধরদের পায়ের আঙ্গুল নাও থাকতে পারে শুনলে কি আমাদের খারাপ লাগবে? বা পা ছোট হয়ে গেলে? কিংবা মাথা বা মস্তিষ্ক বড় হয়ে গেলে? আমাদের শারীরিক আকৃতি তো গত কয়েক শতাব্দীতে অনেক পাল্টেছে। এখনও বিভিন্ন গোত্রের মানুষের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য আছে।

আমার মনে হয়, কিছু একটা বলতে বললে বেশিরভাগ মানুষ মানবিক চেতনাকে গুরুত্ব দেবে। আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, স্বতন্ত্র মানসিক গঠন ইত্যাদি। আমাদের শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা গেছে। এই জিনিসগুলো অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখার মতো। আমরা আমাদের বংশধরদের কাছে মানবিকতা রেখে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারলে শারীরিক আকৃতিতে কী এসে যায়? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা তো অর্জিত হচ্ছেই।

অনুবাদকের নোট

১। বইটি ১৯৯০ এর দশকে লেখা হয়েছিল। তবে আলোচ্য বক্তব্য এখনও সত্য।

২। অনেকটা সাপ বা ব্যাঙয়ের শীতনিদ্রার মতো। এতে করে বেঁচে থাকার জন্যে নিয়মিত খাবার গ্রহণের পয়োজন হয় না। সঞ্চিত চর্বি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া যায়। এ সময় হৃৎস্পন্দন ও বিপাকের হার কমে যায়।